# জনগণ আলুর-দম

রাতুল, সিডনী থেকে

জনগণ সব আলুরদম। সকালের নাস্তায় রুটি কিংবা লুচির সাথের পরম উপাদেয়, চরম সুস্বাদু, সেই আলুরদম। আহা! এর কি তুলনা হয়? তবে, এই নিজেকে; "খাবার খেতে নয়, খাবার হিসেবে"- ভাবতে কার না কষ্ট হয়?

ব্যক্তি সাধারণের অবস্থানকে বিদ্রুপ করে, যে অর্থেই এই রস ও ব্যঙ্গাত্বক উক্তির প্রচলণ শুরু হোক না কেন; অবস্থানগত রুপক সত্যতার দিক থেকে অতুলনীয় । কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্যে- খুব একটা ভেদ নেই। জনগণ ক্ষমতার উৎস, তবে যাঁতাকলে নিষ্পেষিত সকালের নাস্তার উপাদেয় আলুরদমের মতো; জ্বালানীর উপাদান হিসেবেই। ক্ষমতা এনে দেয়, আরোহণের সিড়ি হিসেবে ব্যবহৃত; উপভোগ করার সুযোগ তাদের হয় না। যাদের সে সুযোগ হয় বা যারা এই সুযোগ নেয়; তারা হয় সাধারণ নয়, নয়তো আর সাধারণ থাকে না। চলনে-বলনে, কথায়-কাজে, সুযোগে-সুবিধায় অসাধারণ হয়ে উঠে। কর্ণফুলীতে সম্প্রতি লেখা ঐ নেতাদের মতোই; অকারণে তাদের বুক চিতিয়ে উঠে। এই চিতিয়ে উঠার নিমিত্তেই তাদের গজিয়ে ওঠা। সেটা কি দেশে, কি প্রবাসে। তবে খুব সহজে, অল্প সময়ে চিতিয়ে উঠা নেতার সংখ্যা; মনে হয় প্রবাসেই বেশী। বর্তমান বা প্রবাসের কথা বলার আগে; স্বদেশের মাটি, সেই শেকড়ের গান দিয়েই না হয় শুরু করি।

বহুদিনের পুরনো একটা ঘটনা, ভুলতে পারিনি এখনো । বুকের মাঝে লুকিয়ে আছে, সযতনে। আমি তখন একজন নবীণ সরকারী কর্মচারী। দেশের সামরিক শাসন, সেবারের লেবাসি ***সার্কেল*** শেষ করছে। সামরিক পোষাকের উপর চাপান, নতুন বেসামরিক এক আলখেল্লা। আন্দোলন জমাট বাঁধছে । এই সময় আমার এক বন্ধু (দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থ্যার কর্মকর্তা)-কে নিয়ে সামরিক কার্যালয়ের এক অনেক উঁচু মাথা কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে গেছি। ভদ্রলোক, বন্ধুর নিকট আত্মীয়। কথাবার্তার এক পর্যায়ে বন্ধু তার আত্মীয়কে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করে, "জনগণতো ক্ষেপে উঠছে। এখন কি করবেন?" ভদ্রলোকের উত্তর ছিল, "আরে, রাখো তোমার জনগণ"। তাচ্ছিল্যের সেই সুর, এখনও এই বুকে বাজে। মাঝে মাঝেই জেগে উঠে, কষ্ট দেয়। ভদ্রলোক ধরেই নিয়েছিলেন, আমিও হয়তো তাদের মতোই; এক গোয়ালের গরু।

বলে রাখা ভাল, সেবারের সেই আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে উঠলেও কৃতকার্য্য হয়নি। দেরী করতে হয়েছিল, আর ও বেশ অনেকগুলো বছর। তবে সেই গৌরব মোটেই তাদের ছিল না, অগৌরবের কলঙ্কিত ইতিহাস এই আমাদের, আমাদের নেতা-নেত্রীদের। শত্রুর-শত্রু নাকি সব- সময়ই মিত্র হয়। সেবারেও হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিদন্দ্বীকে থামাতে গণতন্ত্রের মানস কন্যার সেদিন জলপাই রঙের পোষাককেই পছন্দ হয়েছিল বেশী। (১৯৮৬ সনের সংসদ নির্বাচন)

ব্যক্তি বা একক হিসেবে, জনগণ যথার্থই আলুরদম; উপেক্ষিত, নিষ্পেষিত; অবহেলিত । আগে ছিল, এখনো আছে। দেশে প্রবাসে; মনে হয় সর্বত্র। তবুও এই জনগণের উপস্থিতি, তাদের সমর্থন প্রয়োজন হয়, সব সময় না হলেও; মাঝে মাঝে। এদের দিয়ে কিছু হয় না; আবার এদের ছাড়াও হয়না কিছু । বেশ একটা জগা-খিচুড়ি, আলুরদমের অবস্থা। তবে আশে-পাশে জনগনের অবস্থানের প্রয়োজন মনে হয় অনস্বিকার্য্য। এ ব্যাপারে প্রবাসের একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে।

১৯১৩ সালে কবি গুরু রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেই আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী যখন আনন্দে আপ্লুতঃ তেমনি সময়ে (১৯১৯ সালের ১লা মে) কোলকাতায় শ্রীমতি মহামায়া দে-র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমান যুগের গানের ভুবনের এক কিংবদন্তি নায়ক; প্রবোধ চন্দ্র দে। ডাক নাম যাঁর মান্নাদে। এই পরম পুজনীয় গুরুকে একবার খুব কাছ থেকে দেখার, কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বয়স তখন আশির-ঘরের শেষ দিকে। সঙ্গীত অনুষ্ঠাণের নিমন্ত্রণে এসেছেন তিনি। প্রাক অনুষ্ঠান- বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে উপ-মহাদেশের অনেক গন্য-মান্য-নগন্য লোক উপস্থিত। প্রশ্ন উত্তর পর্যায়ের এক পর্বে দুঃখ করে বলেছিলেন, জীবনে কত গান গাইলাম, আর জাতীয় পর্যায়ের প্রথম পুরস্কার(পদ্মশ্রী-১৯৭১) আসলো যে গানে "এ ভাই, যারা দেখকে চলো, আগে ভি নেহি.."। কারণ একটাই, দেশের সাধারন জনগণের এই গানটাই ভাল লেগেছিল। গায়ক-এর কথার সুরই বলে দিয়েছিল, তাঁর নিজের পছন্দের গানের তালিকায় শতকের ভিতরেও নয়; ঐ গানের অবস্থান । কিন্তু ওই যে জনগণ, আলুরদম; এরা পারেও। কিন্তু কখন যে কি পারে, সেইটাই বোঝা ভার। উল্লেখ্য গানটি, রাজ কাপুরের ছবি "মেরা নাম জোকার"-এর ।

সেদিন সেই প্রাক অনুষ্ঠাণের শেষ পর্বে, জলযোগ শেষে অনুষ্ঠান কর্মকর্তাদের একজন যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, "দাদা, কালকের অনুষ্ঠান এতটায় শুরু হবে, মাঝখানে, এটা-সেটা এবং এতক্ষন বিরতি। রাত এতটার মধ্যে শেষ করতে হবে অনুষ্ঠান"। সময়ের অঙ্ক-কষে তিনি দেখেন, প্রায় চার ঘন্টা। রাগ করে চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠেন তিনি। দরজার দিকে মনে হয় দু'এক কদম এগিয়েও থাকবেন। এই বয়সে এতক্ষণ গাণ করা যায়। কর্মকর্তাদের বেকুফের মতো কথায় তিনি ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, ভুল করে তাঁকে কোথায় নিয়ে এসেছে এরা। কর্মকর্তাদের তখন প্রায় হাতে-পায়ে ধরি অবস্থা। সাব্বিস্থ হয়, দাদা যতক্ষণ চান, ততক্ষনই শুধু গান হবে।

পরের দিনের অনুষ্ঠানের ঘটনা। অত্যাধুনিক, রুচি সম্মত বিশাল একটা অডিটরিয়াম কাণায়-

কাণায় পুর্ণ। দাদা হিন্দি-বাংলা-মারাঠী গাণের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। থামতেই চায়না তাঁর ভরাট-কণ্ঠের গানের সেই লহরী। স্টেজের ভিতরে চিরকুট পাঠিয়ে তাঁকে শেষ করতে অনুরোধ করতে হয়েছিল। জনগণের উপস্থিতি যে গায়ক-গায়িকাদের জন্য কি সঞ্জিবনী-সুধা; বুঝতে কষ্ট হয়নি সেদিন।

প্রবাসে এবং এই সিডনীতেও অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি, দেখছি। সব অনুষ্ঠান অবশ্যই সবার জন্য নয়। হওয়ার কথাও নয়। তবে যার বা যাদের অনুষ্ঠান ভাল লাগে, তাদেরও অনেকের কাছে আমাদের, এই জনগণের তেমন কোন মুল্য আছে বলে মনে হয় না। অহংকার হয়তো শিল্পীর ভূষণ। তবে সেটা জনগণকে অবহেলা বা উপেক্ষা না করেও মনে হয় বজায় রাখা যায়। অনুষ্ঠান যদি  সাধারণের জণ্যেই হয়; তবে সেই অনুষ্ঠানের মুল শ্রোতা সম্পর্কে ধারণা থাকা খারাপ না। সমস্ত অনুষ্ঠানের সব-কটা গান, সবগুলো দিক সবার হয়তো ভাল লাগবে না। তাই বলে তার এই মুল্যবোধ *চ্যালেঞ্জের* মোকাবিলায় না পড়াই মনে হয় ভাল।

সিডনীর *ইনার ওয়েস্ট*-এর এক স্কুল ছাত্রীর- টকব্যাক রেডিওতে সেদিন একটা সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। ছোট্ট এই মেয়ে, আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এক কনসার্টে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "তুমি কি ঠিক করেছ, কোন কোন গান গাইবে?" ছোট্ট এই মেয়ে পাকা বুড়ির(জানিনা, আমাদের সব বুড়া-বুড়ির এই জ্ঞান আছে কিনা?) মতো উত্তর দিয়েছিল, "আমার এই  গানটা থাকবে" (নাম করা একটা গান)। "আর, আমরা জানতে চেষ্টা করছি, ঐ অনুষ্ঠানের বেশীর ভাগ শ্রোতা কারা হবে। তার উপর ভিত্তি করে গান নির্ধারণ করবো"।  ছোট্ট এই মেয়ের সাধারণ বুদ্ধিটুকু আমাদের অনেক অসাধারণের মাঝে সঞ্চারিত হ'লে মনে হয়, ভাল হয়। গায়ক-গায়িকা, শিল্পীদের অবশ্যই নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের গান থাকবে; খুবই স্বাভাবিক। একটা অনুষ্ঠানে দেখেছি বড় মাপের এক শিল্পী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই বলছেন; প্রথম পর্বে আমার একটা গান আমার গুরুর চরণে নিবেদিত। শেষ পর্যায়ের দুটো গান আমার নিজেরএকান্তই প্রিয় । জানিনা, আপনাদের ভাল লাগবে কিনা? বিনীত ওই কথা শুণে কার না ভাল লাগে, বিশেষ করে ওই গানগুলো আরও বেশী মন দিয়ে শুনতে?

জনগন-আলুরদম, তবে যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন। একত্রিত হলে খবর আছে। যেমন খবর হয়েছিল '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে, উনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থানে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে, ৯০ এর গণ-আন্দোলনে। তাদের এই আত্মত্যাগ, বুকের দেয়া রক্ত ডিঙিয়ে, এগিয়ে গেছে- উপরে উঠেছে, উঠছেই অনেকে। পিছন ফিরে তাকানোর তাঁদের সময় হয়নি।  এখন জনগণ আলুর দম নয়, এখন মনে হয় পোড়ানো আলুর ভত্তা হচ্ছে। ঠিক আগেরই মতো। একই ভাবে। তবে আর কতদিন?

# আলো আলেয়া – আলেখ্য

খলনায়কও নায়ক। আকৃতি, অবয়ব আর অবস্থানে অভিন্ন। পার্থক্য যেটুকু, সেটা প্রকৃতিতে। খালি চোখে ধরা পড়ে না; বিশেষ করে এই প্রবাস জীবনে। একই মাটিতে গজিয়ে উঠা গাছ তার অবস্থানে বিস্তারিত হলে, সময়ের দিনলিপিতে ধরা থাকে তার বিবর্তন । জানতে, চিনতে সহজ হয় । কিন্তু প্রবাস জীবনে? জ্বলজ্বল করে জ্বলা চতুর্দিকে এই যে এত আলোর ঝলকানী, এর সবটাই কি আলো? নাকি অনেকগুলোই আলেয়া? সামাজিক আর প্রবাস জীবনের আশে-পাশের এই সব আলো আর আলেয়ার উপাখ্যান নিয়ে লিখতে ইচ্ছা আছে এই কলামে । তবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করতে নয়, নিজেদের সচেতন করতে। আপনাদের কেমন লাগছে? খারাপ-ভাল; জানলে খুশী হবো। -লেখক

রাতুল, সিডনী - ১৮/০৬/২০১১

রাতুলের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকা মারুন